Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আধুনিক বিশ্বে কুরআনের বাস্তব নিদর্শন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারজানা আক্তার নীলা

রোলঃ 23100120033

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আধুনিক বিশ্বে কুরআনের বাস্তব নিদর্শন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারজানা আক্তার নীলা

রোলঃ 23100120033

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আধুনিক বিশ্বে কুরআনের বাস্তব নিদর্শন " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফারজানা আক্তার নীলা, আইডিঃ 23100120033 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আধুনিক বিশ্বে কুরআনের বাস্তব নিদর্শন " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।



(স্বাক্ষর)

ফারজানা আক্তার নীলা

আইডিঃ 23100120033

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

- আধুনিক বিজ্ঞানে ইসলামের ভুমিকা.....5
- আল কোরআন মুমিনদের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান.....8
- মুমিনের জীবনে কোরআনের প্রভাব.....9
- কোরআনের আলোকে দুনিয়ার জীবনের বাস্তবতা.....12
- সুন্দর সমাজব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন কুরআনি সমাজ প্রতিষ্ঠা।.....14
- কোরআন থেকে ইতিহাস ও বাস্তবতার নিয়ম বোঝা.....18
- বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব.....22
- আল-কুরআনে বিজ্ঞানের নিদর্শন.....25
- আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান.....27
- কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান: সামঞ্জস্যপূর্ণ না অসামঞ্জস্যপূর্ণ?.....31
- কোরআনে কোন কোন বৈজ্ঞানিক ভুল রয়েছে?.....32
- কুরআনের কি কি বিষয় আছে যেগুলো ভবিষ্যতে আবিষ্কার হতে পারে অথবা সত্যি হতে পারে?.....35

ভূমিকা নয় সূচনা....

আধুনিক বিশ্বে কুরআনের বাস্তব নিদর্শন মূলত এর বৈজ্ঞানিক সত্যতা, ঐতিহাসিক নির্ভুলতা, এবং সর্বজনীন জীবনবিধানের প্রমাণের মধ্যে নিহিত। ১৪০০ বছর আগে নবীর (সা.) মাধ্যমে অবতীর্ণ এই কিতাবে এমন অনেক তথ্য রয়েছে যা আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এখন প্রমাণ করেছে।আধুনিক বিশ্বে কুরআনের উল্লেখযোগ্য বাস্তব নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে:ভ্রূণতত্ত্ব ও মানব সৃষ্টি: মানব ভ্রূণের পর্যায়ক্রমিক গঠন নিয়ে কুরআনের বর্ণনা (সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত ১৪) আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সাথে হুবহু মিলে যায়।মহাজাগতিক সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ: মহাবিশ্বের উৎপত্তি বা বিগ ব্যাং (Big Bang) তত্ত্ব এবং মহাবিশ্বের সম্প্রসারণশীল হওয়ার বিষয়টি সূরা আল-আম্বিয়ার ৩০ নম্বর আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।জ্যোতির্বিজ্ঞান: সূর্য ও চন্দ্রের নিজস্ব কক্ষপথে ঘূর্ণন এবং দিন-রাতের আবর্তন নিয়ে কুরআন শত শত বছর আগে যে তথ্য দিয়েছে, তা আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত।মহাসাগরের বিজ্ঞান: দুই সাগরের পানির মিলনস্থলে একটি অদৃশ্য পর্দা বা অন্তরায় থাকার বিষয়টি (সূরা আর-রহমান, আয়াত ১৯-২০) আধুনিক সমুদ্রবিজ্ঞানে স্বীকৃত।এই বিষয়গুলো প্রমাণ করে যে, কুরআন কেবল ধর্মীয় অনুশাসনের বই নয়, বরং এটি একটি শাশ্বত ও বৈজ্ঞানিক সত্যের মহাগ্রন্থ।

আধুনিক বিজ্ঞানে ইসলামের ভুমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা বা complete code of life. মানব জাতির জন্য প্রয়োজন এমন কোন বিষয় নেই যার বিবরণ ও সুষ্ঠু সমাধান ইসলামে নেই। ইসলাম মানব সমাজকে যা দিয়েছে, অন্য কোন ধর্ম তা দিতে অধ্যাবধি সক্ষম হয়নি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনেও ইসলামের অবদান অসামান্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচনে ইসলাম প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। বলা যায়, আধুনিক বিজ্ঞানের নবজাগরণ সৃষ্টিতে ইসলামের ভূমিকা সর্বাধিক। দেড় হাযার বছর পূর্বে জাহেলিয়াতের প্রগাঢ় অন্ধকারে মানব জাতি অধঃপতনের অতল গহবরে নিমজ্জিত থাকা অবস্থায় বিশ্ব

প্রভু মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেন ইসলামের প্রধান উৎস আল-কুরআন। যাকে তিনি বিজ্ঞানময় বলে ঘোষণা করেন (ইয়াসীন ২)। সে সময় থেকেই ইসলাম বিজ্ঞান সম্পর্কিত নির্ভুল তথ্য প্রদান করে আসছে। তাই ইসলামের সাথে বিজ্ঞানের কোনই বিরোধ নেই। যদিও কেউ কেউ বিজ্ঞানে ইসলামের অবদানকে খুবই খাটো করে দেখার চেষ্টা করেছেন। এটা বড় পরিতাপের বিষয়। ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকার কারণেই এমনটি হয়েছে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মাদ (ছাঃ)ও বিজ্ঞান গবেষণার অনেক উপাত্ত রেখে গেছেন। যা বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন। ইসলাম সর্বদা বিজ্ঞানকে সামনের দিকে এগিয়ে দিতে চেয়েছে। বক্ষমাণ প্রবন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানে ইসলামের ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনা উপস্থাপনের প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

বিজ্ঞান অর্থ বিশেষ জ্ঞান। আমাদের চারপাশে দৃশ্যমান মানব, জীবজগত ও বিভিন্ন বস্তু মানুষের মনে কৌতুহল সৃষ্টি করে এবং এসবের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে সন্তোষজনক সমাধান খুঁজে ফিরে। এই বিশাল বিশ্বজগত কেমন করে চলছে সেই সত্য উদঘাটনই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। কিন্তু বাহ্যিকভাবে পঞ্চেন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকেই বিজ্ঞান একদিন শ্বাশত সত্য বলে যাহির করেছিল এবং ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আল্লাহর বাণীকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। অথচ বিংশ শতাব্দীতে এসে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন বললেন, Science without religion is lame and religion without science is blind অর্থাৎ ধর্মহীন বিজ্ঞান খোড়া এবং বিজ্ঞানহীন ধর্ম অন্ধ।[1] বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পরের পরিপূরক। এতদুভয়ের মধ্যে বিরোধ বা সংঘর্ষের আশংকা থাকতে পারে না। সুতরাং ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নেই। আবার এই বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদানও অনস্বীকার্য। যা অমুসলিম মনীষীগণও স্বীকার করেছেন। যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদানের কথা স্বীকার করে সার্টন বলেন, মানব সমাজের প্রধান কাজ মুসলমানগণ সাধন করেছেন। শ্রেষ্ঠ গণিতবেত্তা আবু কামিল ও ইবরাহীম ইবনে সিনান ছিলেন মুসলমান। সর্বশ্রেষ্ঠ ভূ-গোলবিদ ও বিশ্বকোষ প্রণেতা আল-মাসঊদী ছিলেন মুসলমান। সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আত-তাবারীও ছিলেন মুসলমান।[2] আমরা প্রকৃত সত্য উদঘাটনের মানসে সজাগ দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই, প্রতিটি বিষয়ে মুসলমানদের অবদান অসামান্য। যেমন আমরা দেখতে পাই বিজ্ঞানে মুসলমানদের ভূমিকার বর্ণনা দিতে গিয়ে মনীষী রবার্ট ব্রিফো নির্দ্বিধায় উল্লেখ করেছেন,

Science is the most momentous contribution of Arab civilization to the modern world. The debt of our science to the Arabs does not consist in starting discoveries or revolutionary theories; Science owes a great deal more to Arab culture it owes its existence.

অর্থাৎ আধুনিক বিজ্ঞান শুধুমাত্র চমকপ্রদ আবিষ্কার বা যুগান্তকারী তত্ত্বকথার জন্যই মুসলমানদের কাছে ঋণী নয়, আধুনিক বিজ্ঞান তার অস্তিত্বের জন্যই মুসলমানদের নিকট চিরঋণী। বলা বাহুল্য, ইসলামের আবির্ভাব না ঘটলে আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হ'ত না। হ'লেও তা নিশ্চিতরূপে যথেষ্ট বিলম্বিত হ'ত'।[3] অনুরূপভাবে বিখ্যাত পন্ডিত জওহরলাল নেহরুও স্বীকৃতি প্রদান করেছেন,

Among ancients we do not find the scientific method in Egypt or China or India. We find just a dit of it in old Greece. In Rome again it was absent. But the Arabs had this scientific spirit of inquiry and so they may be considered the fathers of modern science.

অর্থাৎ আমরা মিশরীয়, চীনা ও ভারতীয় আদি সভ্যতাগুলোতে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব খুঁজে পাই না। তবে প্রাচীন গ্রীস সভ্যতায় এর কিছুটা প্রমাণ মেলে। আর রোম সভ্যতায় তা ছিল রীতিমত অনুপস্থিত। কিন্তু আরবদের মাঝে প্রাণবন্ত, অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞান বিদ্যমান ছিল। সুতরাং তাদেরকে (মুসলিমদেরকে) আধুনিক বিজ্ঞানের জনক বলা যেতে পারে।[4]

পবিত্র কুরআনে বিভিন্নভাবে মানুষকে বিজ্ঞানের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ 'নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের ছোট বড় অণু-পরমাণু এমন কোন বস্তু নেই যার উল্লেখ সুস্পষ্ট কিতাবে (কুরআনে) নেই' (সাবা ৩)। তিনি অন্যত্র বলেন, انظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার প্রতি লক্ষ্য কর' (ইউনুস ১০১)।

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণার যথেষ্ট খোরাক রয়েছে। জার্মান বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন কুরআনের আয়াতেরই ভাব প্রকাশ করলেন এভাবে, He who can no longer pause to wonder and stand rapt in awe is as good as dead and his eyes are closed. Books & Literature

অর্থাৎ ‘যে মানুষ সৃষ্টি জগতের অবলিলা দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয় না, তার মনে ভয়-ভীতি রেখাপাত করে না, সে যেন মৃতবৎ, দৃষ্টিশক্তি তার রহিত হয়ে গেছে’।[5]

মানুষের সামনে আল্লাহর নিদর্শন সমূহের উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, ‘তাদের জন্য আর একটি নিদর্শন রাত্রি, আমরা তা হ’তে দিনকে বের করে আনি, তৎক্ষণাৎ তারা অন্ধকারে এসে যায় এবং সূর্য তার নিজের অবস্থান স্তরেরও পর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চলেছে, এটা সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ আল্লাহরই নির্দেশ। চন্দ্রের জন্য আমরা তার মনযিল নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, এমনকি অবশেষে তা পুনরায় খেজুরের পুরাতন শুকনা শাখার মত হয়ে যায়।

আল কোরআন মুমিনদের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান

ওপর আল্লাহ তাআলার ফয়সালা নির্ভর করে থাকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে বলেছেন, মৌমাছির পেট থেকে রঙ-বেরঙের পানীয় নির্গত হয়, তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সুরা আন-নাহল, আয়াত ৬৯) আল্লাহ তাআলা যে জীবন বিধান দিয়েছেন তাই মানুষের সমগ্র জীবনের সর্বদিকের ওষুধ। রোগ নিরাময়ের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত চিকিৎসক, রোগ নির্ণয়, সঠিক ওষুধ এবং সঠিক সেবনবিধি। এ চারটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে রোগের চিকিৎসা। আল্লাহ তাআলা রোগ সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য ওষুধও সৃষ্টি করেছেন। (বুখারি) সবশেষে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত মহানবী (সা.) এর একটি উক্তির মাধ্যমে লেখা শেষ করবো

তা হলো, তোমরা দু'টি শেফাদানকারী বস্তুকে নিজেদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় করে নাও, একটি মধু (আহার্যের মধ্যে) এবং অপরটি আল কুরআন (কিতাবসমূহের মধ্যে) (মিশকাত শরীফ)।

তাই দেখা যায় জীবনের প্রতিটি বিভাগের জন্য ইসলাম প্রদত্ত মূলনীতি আজো ঠিক সে রকমই অভ্রান্ত এবং অনন্য, যেমনটা ছিল এর প্রথম যুগে। ইসলামের মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে মুসলিম জাতির অধঃপতনের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। বিশ্বের যে কোনো ধর্ম, বর্ণ ও জাতি গোষ্ঠীর লোকেরাই ইসলামকে তাদের জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করবে, তারা অবশ্যই বিশ্বের সেরা, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বসুন্দর মানব দলে পরিণত হবে। ইসলামের প্রথম দিকের হাজার বছরের ইতিহাস এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ইসলামের বিধানগুলো মেনে চলার তৌফিক দান করুন। আমিন

মুমিনের জীবনে কোরআনের প্রভাব

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি নুর বা জ্যোতি আল্লাহ তাঁর বাণী কোরআনে রেখেছেন। তাই কোরআনই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি প্রভাব সৃষ্টিকারী গ্রন্থ।
কোরআনের এই প্রভাব তাঁর ভাব, ভাষা ও অন্তর্নিহিত নিগূঢ় রহস্যের কারণে। যে ব্যক্তি কোরআনকে যত বেশি ধারণ করবে, সে তত বেশি আলো লাভ করবে। কোরআনের এই অন্তর্নিহিত নিগূঢ় রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ বলেন, 'যদি আমি এই কোরআন পর্বতের ওপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি তাকে আল্লাহর ভয়ে বিনীত এবং বিদীর্ণ দেখতে। আমি এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য, যাতে তারা চিন্তা করে।
' (সুরা হাশর, আয়াত : ২১)
কোরআনের ধারক হয় যারা : পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষরাই আল্লাহর বাণীর ধারক হয়ে থাকে। যেমন কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'এরাই তারা নবীদের মধ্যে যাদের আল্লাহ

অনুগ্রহ করেছেন, আদমের বংশ থেকে এবং যাদের আমি নুহের সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম এবং ইবরাহিম ও ইসমাইলের বংশোদ্ভূত ও যাদের আমি পথনির্দেশ করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম; তাদের কাছে দয়াময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হলে তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ত কান্না করতে করতে।' (সুরা মারিয়াম, আয়াত : ৫৮)

সাইয়েদ কুতুব শহীদ (রহ.) লেখেন, নবী-রাসুলদের পাশাপাশি আল্লাহ তাদেরও তাঁর বাণীর (কোরআনের) ধারক বানাবেন, যাদের ভেতর আয়াতের শেষাংশে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকবে। অর্থাৎ যাদের মধ্যে আল্লাহভীতি প্রবল, যারা আল্লাহর ব্যাপারে সূক্ষ্ম অনুভূতির অধিকারী, কোরআন তিলাওয়াত করলে যারা প্রকম্পিত হয়, তাদের ভেতর সৃষ্ট অনুভূতি প্রকাশে শব্দমালা যথেষ্ট হয় না।

ফলে তারা অশ্রুবর্ষণ করে এবং কান্নারত অবস্থায় সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। (ফি দিলালির কোরআন : ৪/২৩১৪)

মুমিনের জীবনে কোরআনের প্রভাব

মুমিনের যাপিত জীবনে কোরআনের প্রভাব নানাভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে। যার কয়েকটি নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

১. হৃদয় বিগলিত হওয়া : কোরআন সর্বপ্রথম মুমিনের হৃদয়কে প্রভাবিত করে। যখন সে কোরআন শ্রবণ করে, তখন তাঁর হৃদয় বিগলিত হয়।

মহান আল্লাহ বলেন, 'মুমিন তো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের কাছে পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের ওপরই নির্ভর করে।' (সুরা আনফাল, আয়াত : ২)

২. আত্মার প্রশান্তি লাভ : কোনো সন্দেহ নেই কোরআন তিলাওয়াত আল্লাহর উত্তম জিকির বা স্মরণ। কোরআন তিলাওয়াত মুমিনের হৃদয়কে প্রশান্ত করে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়; জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।' (সুরা রাদ, আয়াত : ২৮)

৩. সিজদায় লুটিয়ে পড়া : মুমিন যখন আল্লাহর বাণী কোরআন তিলাওয়াত করে বা তা শ্রবণ করে, তারা শ্রদ্ধাবনত হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। ইরশাদ হয়েছে, 'কেবল তারাই আমার নিদর্শনাবলি বিশ্বাস করে, যারা তার দ্বারা উপদিষ্ট হলে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আর তারা অহংকার করে না।' (সুরা সাজদা, আয়াত : ১৫)

৪. গা রোমাঞ্চিত হওয়া : আল্লাহর কোরআন পাঠ করলে মুমিনের গা রোমাঞ্চিত হয়। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণীসংবলিত কিতাব, যা সুসামঞ্জস্য এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত করা হয়। এতে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের গা রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাদের দেহমন বিনম্র হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটাই আল্লাহর পথনির্দেশ, তিনি তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই।' (সুরা ঝুমার, আয়াত : ২৩)

৫. কান্না করা : মুমিন কোরআন তিলাওয়াত করলে তাদের হৃদয় বিগলিত হয় এবং তারা কান্না করে। ইরশাদ হয়েছে, 'রাসুলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন তারা শ্রবণ করে, তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে তার জন্য তুমি তাদের চক্ষু অশ্রু বিগলিত দেখবে। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং তুমি আমাদের সাক্ষ্যবহদের তালিকাভুক্ত কোরো।' (সুরা মায়িদা, আয়াত : ৮৩)

৬. আধার থেকে আলোর পথে : কোরআন মুমিনদের আধার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে। ইরশাদ হয়েছে, 'যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এটা দ্বারা তিনি তাদের শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং তাদের সরল পথে পরিচালিত করেন।' (সুরা মায়িদা, আয়াত : ১৬)

৭. অন্তরের আরোগ্য লাভ : কোরআন মুমিনের রোগ-ব্যধি, সংশয় ও দ্বিধা দূর করে দেয়। ইরশাদ হয়েছে, 'হে মানুষ, তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে

এসেছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তার আরোগ্য এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।' (সুরা ইউনুস, আয়াত : ৫৭)

কোরআন দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া নিন্দনীয় : যারা কোরআন থেকে বিমুখ হয়ে থাকে এবং কোরআন যাদের অন্তরকে প্রভাবিত করতে পারে না, তারা হতভাগ্য। পবিত্র কোরআনে তাদের ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে, 'তারা বলে, তুমি যার প্রতি আমাদের আহ্বান করছ সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ-আচ্ছাদিত, আমাদের কানে আছে বধিরতা এবং তোমরা ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল; সুতরাং তুমি তোমার কাজ করো এবং আমরা আমাদের কাজ করি।' (সুরা হা-মিম-সাজদা, আয়াত : ৫)

আল্লাহ সবাইকে কোরআন দ্বারা উপকৃত করুন। আমিন

কোরআনের আলোকে দুনিয়ার জীবনের বাস্তবতা

দুনিয়ামুখী মানুষের সব স্বপ্ন ও আয়োজন দুনিয়া ঘিরে। গগনচুম্বী সব টাওয়ার, পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, দম্ভ-অহংকার যে দুনিয়াকে কেন্দ্র করে, ওই দুনিয়া নিমেষে ধ্বংস হয়ে যাবে। যে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মোহে পড়ে মানুষ চিরস্থায়ী আখিরাতকে ভুলে যায়, সে দুনিয়া সম্পর্কে এর স্রষ্টা মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআন মাজিদে সুস্পষ্ট বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এখানে সে বিষয়ে উল্লেখ করা হলো:

ধোঁকার উপকরণ: পার্থিব জীবনকে আল্লাহ খেল-তামাশা ও ধোঁকার উপকরণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, 'অতঃপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই-ই হবে সফল। বস্তুত পার্থিব জীবন ধোঁকার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়।' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৮৫)

খেল-তামাশা: দুনিয়ার জীবন প্রকৃতপক্ষে সাময়িক সুখ ও ভোগের উপকরণ। মহান আল্লাহ বলেন, 'পার্থিব জীবন খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। আর নিঃসন্দেহে

আল্লাহভীরুদের জন্য পরকালীন জীবনই উত্তম। এর পরও কি তোমরা বুঝবে না।' (সুরা : আনআম, আয়াত : ৩২)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'এই পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া কিছু নয়। আর পরকালীন জীবন হলো চিরস্থায়ী, যদি তারা জানত।' (সুরা : আনকাবুত, আয়াত : ৬৪)

ধ্বংসপ্রাপ্ত শস্যক্ষেতের মতো: দুনিয়াকে আল্লাহ বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন ফসলভরা মাঠ এবং আল্লাহর হুকুমে নিমেষে তা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'দুনিয়ার জীবনের দৃষ্টান্ত যেমন বৃষ্টির পানি, যা আমরা আকাশ থেকে বর্ষণ করি। অতঃপর জমিনের উদ্ভিদসমূহ তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়, যা থেকে মানুষ ও গবাদি পশু ভক্ষণ করে। অবশেষে যখন জমিন শস্য-শ্যামল ও সুশোভিত হয় এবং ক্ষেতের মালিক মনে করে যে এবার তারা ফসল ঘরে তুলতে সক্ষম হবে, এমন সময় হঠাৎ রাতে বা দিনের বেলায় ওই ক্ষেতের ওপর আমাদের (শাস্তির) নির্দেশ এসে যায়। অতঃপর সেটিকে আমরা খড়-কুটোয় পরিণত করে ফেলি, যেন গতকাল সেখানে কিছুই ছিল না। এভাবে আমরা আয়াতসমূহকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করি—চিন্তাশীল লোকদের জন্য।' (সুরা : ইউনুস, আয়াত : ২৪)

দুনিয়ার জীবন সাময়িক ভোগ্যবস্তু: মহান আল্লাহ বলেন, 'দুনিয়ার এই জীবন সাময়িক ভোগ্যবস্তু ছাড়া কিছুই নয়। আর নিশ্চয়ই আখিরাত হলো চিরস্থায়ী নিবাস।' (সুরা : মুমিন, আয়াত : ৩৯)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'মানুষের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে তাদের আসক্তিসমূহকে তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি, স্বর্ণ ও রৌপ্যের রাশিকৃত সঞ্চয়সমূহের প্রতি, চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু ও শস্যক্ষেতসমূহের প্রতি। এসবই পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু মাত্র। আর আল্লাহর কাছেই আছে সুন্দরতম ঠিকানা।' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৫

আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার সময়সীমা: আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার সময়সীমা অতি নগণ্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'আর যেদিন তিনি তাদের একত্র করবেন (সেদিন

তারা মনে করবে), যেন তারা পৃথিবীতে শুধু দিনের একটা মুহূর্ত অবস্থান করেছিল। সেদিন তারা পরস্পরকে চিনবে। নিশ্চয়ই সেদিন তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যারা আল্লাহর সাক্ষ্যকে মিথ্যা বলেছিল এবং যারা সুপথপ্রাপ্ত ছিল না।' (সুরা : ইউনুস, আয়াত : ৪৫)

অন্য আয়াতে এসেছে, 'আল্লাহ বলবেন, বছরের হিসাবে তোমরা পৃথিবীতে কত দিন ছিলে? তারা বলবে, আমরা ছিলাম এক দিন বা তার কিছু অংশ। অতএব, গণনাকারীদের (ফেরেশতাদের) জিজ্ঞেস করুন! আল্লাহ বলবেন, তোমরা সেখানে ছিলে মাত্র অল্প সময়—যদি তোমরা জানতে।' (সুরা : মুমিনুন, আয়াত : ১১২-১১৪)

রাসুল (সা.) বলেন, আল্লাহর শপথ! আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হলো যেমন তোমাদের কেউ মহাসমুদ্রের মধ্যে নিজের একটি আঙুল ডুবিয়ে দেয়। এরপর সে লক্ষ্য করে দেখুক যে তা কি (পরিমাণ পানি) নিয়ে এলো। তিরিমিজি, ২৩২৩)

সুন্দর সমাজব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন কুরআনি সমাজ প্রতিষ্ঠা।

মহাগ্রন্থ আল কুরআন। স্রষ্টার মহাদান, রাসূল (সা)-এর শ্রেষ্ঠ মোজেজা, বান্দার জন্য রহমতের ভান্ডার। সর্বোপরি বিশ্বমানবতার মুক্তির মহাসনদ। কুরআন এমন একটি কিতাব যা তিলাওয়াত করলেও সওয়াব, শুনলেও সওয়াব, শিখলেও সওয়াব, শেখালেও সওয়াব, আমল করলেও সওয়াব, কাউকে আমল করতে উৎসাহিত করলেও সওয়াব। কুরআনি সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শহীদ হলেও সওয়াব, গাজী হলেও সওয়াব। পৃথিবীতে কুরআন ছাড়া এমন কোনো গ্রন্থ নেই যা তার অনুসারীদেরকে এভাবে উজ্জীবিত করে।

কুরআন নাজিলের মূল উদ্দেশ্য

১. সঠিক পথনির্দেশনা- কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েত, রহমত ও সুসংবাদের ঘোষণা এবং দিশেহারা মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দানের নিমিত্তে আল্লাহ তায়ালা আল কুরআন অবতীর্ণ করেন।

২. সমস্যার সমাধান- বিশ্বমানবতা যখন চরম সমস্যায় জর্জরিত হয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত, যখন বিশ্বমানবতা আশা করছিল ওপরের ফয়সালা, ঠিক তখনিই আল্লাহ তায়ালা সব সমস্যার সমাধানকল্পে আলোকবর্তিকা রূপে কুরআনুল কারিম অবতীর্ণ করেন।

৩. সতর্কবার্তা প্রদান- কুরআন আল্লাহপ্রদত্ত সব নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার পাশাপাশি অতীতের হটকারী জাতিগুলোর ভুলের শোচনীয় পরিণামসমূহ উল্লেখের মাধ্যমের মানবসমাজকে সতর্কতা প্রদানের নিমিত্তে আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়।

৪. ভ্রান্ত বিশ্বাসের অপনোদন- ইসলাম-পূর্ব আরব সমাজের লোকেরা বিভিন্ন ভ্রান্ত আকিদা পোষণ করত। নিজেদের মনমতো বিধান তৈরি করে জীবন অতিবাহিত করত। তারা ছিল চরম কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। তাদের সে ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা খন্ডনের নিমিত্তে কুরআন অবতীর্ণ হয়।

৫. ইসলামী সমাজের রূপরেখা প্রণয়ন- মানবরচিত সব মতাদর্শ উৎখাত করে ইসলামী সমাজের বাস্তব রূপরেখা প্রণয়ন তথা কুরআনের বিধান কায়েম করা। বস্তুত এটাই ছিল কুরআন নাজিলের মূল উদ্দেশ্য।

৬. শিরকমুক্ত সমাজ গঠন- আল-কুরআন নাজিলের পূর্বে মানবতা ছিল জাহেলিয়াতের ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। শিরক, কুফর আর নিফাকিতে সয়লাব ছিল মানবসমাজ। কুরআন এসেই বিশ্ববাসীকে এসব মুনকার কাজ থেকে মুক্ত করে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির পথনির্দেশ প্রদান করে।

৭. ইনসাফ প্রতিষ্ঠা- অন্যায়, জুলম-অত্যাচার, মানবাধিকার লঙ্ঘনে বিশ্বমানবতা অস্থির। আর এ জন্য দরকার ন্যায় ও ইনসাফের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া। কুরআন নাজিলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

৮. রবের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন- প্রতিটি মুমিনেরই একান্ত কামনা থাকে তার মনিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ। কুরআন এ কামনা পূরণে পথনির্দেশ হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে।

৯. সত্যায়নকারী- সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব হলো আল-কুরআন। এর আগে অনেক আসমানি কিতাব ও অগণিত নবী-রাসূল পৃথিবীতে আগমন করেছেন। কুরআন এসে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলসহ আল্লাহপ্রদত্ত আসমানি কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করেছে।

১০. তাজকিয়ায়ে নফস- সর্বোপরি দুনিয়ার সব কর্মকান্ডে বান্দার আত্মপরিশুদ্ধি লাভে কুরআন এক কার্যকর টনিক হিসেবে অবতীর্ণ হয়।

কুরআনি সমাজ কেন দরকার?

কুরআনি সমাজ মানে আল্লাহর অহির দিকনির্দেশনার আলোকে সমাজ পরিচালিত হবে। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর হেদায়েতের অনুসরণের বিকল্প নেই। আল্লাহর রাসূল হিলফুল ফুজুুল করেও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। হেরাগুহায় ধ্যান করেছিলেন। অহি দিয়ে ২৩ বছরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সুন্দরী রমণী ঘর থেকে একাকী বের হতে পারতো। জাকাত নেয়ার মতো লোক ছিল না। হযরত আবদুল আজিজ ছেলেকে রাষ্ট্রীয় তহবিলের একটি খেজুর দেননি আল্লাহর ভয়ে। ব্যক্তিগত কথা বলার সময় রাষ্ট্রেীয় অর্থের বাতি নিভিয়ে রাখতেন। কুরআনি সমাজ ছাড়া এমন সুখ পাওয়া যায় না।

কুরআনি সমাজের কিছু বৈশিষ্ট্য

কুরআনি সমাজ মানে আইন হবে আল্লাহর। জনগণের পরিবর্তে সার্বভৌমত্বের মালিক হবেন আল্লাহ। রাষ্ট্র ইসলামী চিন্তাবিদদের ইজতিহাদের আলোকে বিস্তারিত আইন কানুন করবে। মানবরচিত আইন প্রণেতারা সুদূরপ্রসারী ভালো-মন্দ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। কারণ তারা গায়েব জানেন না। ভবিষ্যতে মানবসমাজের সুখ কিসে নির্ভর তা তিনিই বলতে পারেন; যিনি আলেম আল গায়ব।

কুরআনি সমাজ মানে রাষ্ট্রের সর্বত্র আদল তথা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। রাষ্ট্রনায়কও আইনের ঊর্ধ্বে থাকবেন না। বর্তমান প্রচলিত আইনে রাষ্ট্রপ্রধান দায়িত্ব পালনকালে আইনের ঊর্ধ্বে। হযরত আলী (রা)-এর সাথে ইহুদির মীমাংসার জন্য খলিফা আদালতে গিয়েছিলেন। আদালত প্রভাবান্বিত করেননি। রাষ্ট্র মানুষের ওপর কোন জুলুম করবে না। এক মানুষ আরেক মানুষের ওপর জুলুম করা থেকেও বিরত থাকবে।

কুরআনি সমাজ মানে সমাজের সকল মানুষ নিঃশর্তভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। রাষ্ট্রনায়করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে অস্বীকার করলে তাদের আনুগত্য করা থেকে বিরত থাকবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে এমন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নাগরিকরা চেষ্টা করবে।

কুরআনি সমাজ মানে সে সমাজের কেউ দুনিয়ার কোনো সত্তাকে ভয় পাবে না। একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করবে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য ইসলামের শৌর্য-বীর্য বিসর্জন দেবে না। প্রয়োজনে শাহাদাত বরণ করবে।
কুরআনি সমাজ মানে সে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে পরামর্শভিত্তিক। ক্ষমতাসীনরা স্বেচ্ছাচারী হবেন না।

কুরআনি সমাজ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে
কুরআনি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সে পথ ও কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে যে পথ ও কর্মপদ্ধতি মুহাম্মদ (সা) অনুসরণ করে তদানীন্তন সমাজে কুরআনের রাজ কায়েম করেছিলেন। কুরআনি সমাজ প্রতিষ্ঠায় রাসূলে কারিম (সা)-এর সুন্নাহ বোঝার জন্য যেমনিভাবে কুরআন ও হাদিসের ভাষার জ্ঞান থাকতে হবে, তেমনিভাবে কোন প্রেক্ষাপটে কুরআন ও হাদিসের সে বিধান নাজিল হয়েছিল তাও জানতে হবে। কেননা কুরআন ও হাদিসের অনেক বিধান মুহকাম তথা সুস্পষ্ট। তা সময় ও যুগের প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন হয় না। যেমন মদ হারাম হওয়ার বিষয়। আবার কিছু বিষয় আছে তা কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইজতিহাদের সাথে নির্ভরশীল। যেমন বদর যুদ্ধের বন্দীদের সাথে যে আচরণ করা হয়েছে আজকের যুগে বন্দীদের সাথে হুবহু কি সেই আচরণ করতে হবে?

কোরআন থেকে ইতিহাস ও বাস্তবতার নিয়ম বোঝা

কোরআন মানুষের জন্য শুধু ধর্মীয় নির্দেশনার গ্রন্থ নয়, এটি একটি জীবনবিধান, যা আমাদের ইতিহাস ও বাস্তব জীবনের নিয়ম-কানুন বুঝতে সাহায্য করে। কোরআন আমাদের ইতিহাসের ধারা পর্যবেক্ষণ করে নিজেদের ভবিষ্যৎ গঠন করার উপায় শিক্ষা দেয়।

কোরআন বলে যে জীবনের সবকিছু—ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সমাজ ও সভ্যতার উত্থান-পতন—একটা নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে চলে। কোরআনের শেখানো এই ধরনের নিয়মগুলোকে বলা হয় কোরআন 'সুনান'। সুনান মানে 'রীতি' বা 'নিয়ম'। মানে আল্লাহর নির্ধারিত সেই সার্বজনীন নিয়ম, যা প্রকৃতি, সমাজ এবং ইতিহাসের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে।

এই নিবন্ধে আমরা দেখব কীভাবে কোরআন আমাদের এই নিয়মগুলো বোঝার এবং জীবনে কাজে লাগানোর শিক্ষা দেয়।

জীবনের পথপ্রদর্শক কোরআন

ইসলাম বিশ্বের সার্বজনীন নিয়মের অংশ। এটি শুধু ধর্মীয় বিধান নয়, বরং মানুষের জন্য এমন একটি পথনির্দেশ, যা নবীগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানবজাতির সামনে তুলে ধরেছেন। (মালিক বিন নবি, আল-জাহিরাতুল কুরআনিয়া, দামেস্ক, দারুল ফিকর, ১৪২৪ হি./২০০০ খ্রি., পৃষ্ঠা: ৩০০)

ইসলামের আগমন মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদী চিন্তার জন্ম দিয়েছে।

আল্লামা মুহাম্মাদ ইকবাল

কোরআন এমন একটি গ্রন্থ, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ধারণ করে। আল্লাহ বলেছেন, "নিশ্চয় এই কোরআন সবচেয়ে সঠিক পথের দিকে পথ দেখায় এবং সৎকাজকারী মুমিনদের জন্য সুসংবাদ দেয় যে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।" (সুরা ইসরা, আয়াত: ৯)

আয়াত থেকে বোঝা যায়, কোরআন শুধু আধ্যাত্মিক পথ দেখায় না, বরং জীবনের সব ক্ষেত্রে—ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং ঐতিহাসিক—পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে।

এই নির্দেশনা কোনো আবেগের ফল নয়। বরং কোরআনের গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে বোঝা যায় যে তাতে ইতিহাস ও সমাজের নিয়ম বোঝার জন্য একটি পরিষ্কার কাঠামো আছে। বোঝা যায়, ইতিহাস কোনো এলোমেলো ঘটনার সমষ্টি নয়, বরং আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মের অধীনে পরিচালিত হয়।

কোরআন ও যুক্তিবাদী চিন্তা

দার্শনিক আল্লামা মুহাম্মাদ ইকবাল বলেছেন, ইসলামের আগমন মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদী চিন্তার জন্ম দিয়েছে। (মুহাম্মাদ ইকবাল, তাজদিদুল ফিকরিদ দীনি ফিল ইসলাম, মাকতাবাতুল ইসকান্দারিয়া, ২০১০ খ্রি., পৃষ্ঠা: ২০৭-২০৮)

কোরআন মানুষকে বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিবাদী চিন্তার দিকে ডাকে। এটি কুসংস্কার, পৌরাণিক বিশ্বাস বা পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুকরণকে প্রত্যাখ্যান করে। কোরআন বলছে, মানুষকে নিজের স্বাধীন চিন্তা ও পছন্দের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কোরআন ইতিহাসের ব্যাখ্যায় কাকতালীয়তা বা নিয়তিবাদকে (যেমন, সবকিছু ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে) প্রত্যাখ্যান করে এবং মানুষকে উদ্যোগী হতে বলে।

কোরআন আমাদের শেখায়, ইতিহাস ও সমাজের গতিশীলতা কিছু নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে চলে। এই নিয়মগুলো অপরিবর্তনীয়, নিরপেক্ষ এবং সুনির্দিষ্ট।

উমর উবাইদ হাসানা বলেন, “এই নিয়মগুলো হলো বিশ্বকে শাসনকারী আইন। এটি আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্য, যা কারণ ও ফলাফলের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে এবং পরিশ্রমের প্রতি ন্যায্য প্রতিদান দেয়।” (মাজিদ আরসান আল-কিলানি, মাকুইমাতুশ শাখসিয়াতিল মুসলিমা আও আল-ইনসানুস সালিহ, দোহা, রিয়াসাতুল মাহাকিমিশ শারইয়া ওয়াশ শুউনুদ দিনিয়া, পৃষ্ঠা: ১৪, উমর উবাইদ হাসানার ভূমিকা)

ইতিহাসের নিয়ম: কোরআনের দৃষ্টিকোণ

কোরআন আমাদের শেখায় যে ইতিহাস কোনো এলোমেলো ঘটনার সমষ্টি নয়। বরং এটি আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মের অধীনে চলে। কোরআন বলে, "তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো, যারা পূর্বে ছিল তাদের পরিণতি কী হয়েছে।" (সুরা রুম, আয়াত: ৪২)

এটি আল্লাহর নিয়ম, যা পূর্ববর্তীদের জন্য প্রযোজ্য ছিল, এবং তুমি আল্লাহর নিয়মের কোনো পরিবর্তন পাবে না।

সুরা আহজাব, আয়াত: ৬২

এই আয়াত আমাদেরকে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে বলে। এটি আমাদেরকে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর উত্থান-পতনের কারণ বোঝার জন্য উৎসাহিত করে। কোরআন আরও বলে, "এটি আল্লাহর নিয়ম, যা পূর্ববর্তীদের জন্য প্রযোজ্য ছিল, এবং তুমি আল্লাহর নিয়মের কোনো পরিবর্তন পাবে না।" (সুরা আহজাব, আয়াত: ৬২)

বোঝা যায়, ইতিহাসের নিয়ম অপরিবর্তনীয় এবং নিরপেক্ষ।

আবার, কোরআন বলে, "তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো, আল্লাহ কীভাবে সৃষ্টির সূচনা করেছেন। তারপর আল্লাহ পুনরায় সৃষ্টি সৃজন করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।" (সুরা আনকাবুত, আয়াত: ২০)

অর্থাৎ বিশ্বের সবকিছু—প্রকৃতি, সমাজ, ইতিহাস—আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মের অধীনে চলে।

বাস্তব জীবনে নিয়মের প্রয়োগ

কোরআনের নিয়মগুলো শুধু তাত্ত্বিক নয়, এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও কাজে লাগে। আজকের বিশ্বে আমরা অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি—পশ্চাদপসরণ, ঔপনিবেশিকতা, আধুনিকতা, পশ্চিমা প্রভাব, বিশ্বায়ন ইত্যাদি।

অনেকে এই ঘটনাগুলোকে ভাগ্যের লিখন বা অপ্রতিরোধ্য শক্তি মনে করে হতাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু কোরআন আমাদের শেখায় যে এই সব ঘটনা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়। এগুলো নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে চলে। এই নিয়মগুলো বোঝার মাধ্যমে আমরা এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে পারব।

বুঝতে হবে।

যেমন, কোনো জাতির উত্থান-পতন নির্ভর করে তাদের কাজ, বিশ্বাস এবং নিয়মের প্রতি তাদের সচেতনতার উপর। যারা এই নিয়মগুলো বোঝে এবং তা কাজে লাগায়, তারা ইতিহাসে সফলতা অর্জন করে। আর যারা এই নিয়মগুলো উপেক্ষা করে, তারা পিছিয়ে পড়ে।

কোরআন আমাদেরকে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে বলে। বলে, আদ, সামুদ, ফিরাউনের জাতি—এদের পতনের কারণ ছিল তাদের অহংকার, অবাধ্যতা এবং নিয়মের প্রতি অবহেলা। কোরআন আমাদেরকে এই ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নিতে এবং সঠিক পথে চলতে বলে।

ঔপনিবেশিকতা বা পশ্চাদপসরণের মতো ঘটনাগুলো আমরা কেবল ‘ভাগ্য’ বলে ছেড়ে দিতে পারি না। বরং আমাদের বুঝতে হবে কেন একটি জাতি পিছিয়ে পড়ে এবং কেন আরেকটি জাতি শক্তিশালী হয়।

আধুনিক সময়ে কোরআনের নিয়ম

আজকের বিশ্বে আমরা নানা সংকটের মুখোমুখি। বিশ্বায়ন, পশ্চিমা প্রভাব, প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি—এই সবই আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ। কিন্তু কোরআন আমাদের শেখায় যে এই সব ঘটনা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়। এগুলো নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে চলে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব

কোরআন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব। যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে জিব্রাইল (আঃ)-এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি সকল বিষয়ে কোরআনের অবদান ও বৈশিষ্ট্য ব্যাপক। বিশেষত বিজ্ঞান নিয়ে কোরআনের আলোচনা বিজ্ঞানীদের নজর কেড়েছে। আধুনিক বিশ্বের অনেক আবিষ্কার সম্পর্কে কোরআন শত শত বছর পূর্বেই বর্ণনা করেছে। তাছাড়া বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল হলেও কোরআন অপরিবর্তনশীল। কোরআনী তাৎপর্যে অনেক বিজ্ঞানী ও ধর্মযাজক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। যার দ্বারা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

কোরআনের প্রায় এক হাজার আয়াত বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট। উল্লেখযোগ্য কিছু আয়াত ও বিজ্ঞানের আবিষ্কার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. পৃথিবীর আকৃতি:

পৃথিবীর আকৃতি নিয়ে বিজ্ঞানীদের বারংবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের পর সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হল পৃথিবী গোলাকার। তবে বলের মতো গোলাকার নয়; ভূ-গোলকের মত গোলাকার অর্থাৎ মেরুকেন্দ্রিক চ্যাপ্টা আকৃতি।

কোরআনে চৌদ্দশত বছর পূর্বেই পৃথিবীর আকৃতি উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ পৃথিবীকে ডিম্বাকৃতির ন্যায় তৈরি করেছেন।" (সূরা নাজিয়াত-৩০)

ডিম্বাকৃতি হলো মেরুকেন্দ্রিক চ্যাপ্টা আকৃতি।

২. মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ ও বিগ ব্যাং থিওরি:

বিশ শতকের শুরুর দিকে মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাবল প্রমাণ করেন যে, মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। এবং উক্ত পর্যবেক্ষণকে ব্যাখ্যা করে বেলজিয়াম জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও ধর্মযাজক জর্জ লেমাইত্রে ১৯২৯ সালে বিগ ব্যাং থিওরি (মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব) অর্থাৎ মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কিত তথ্য তুলে ধরেন।

যে সম্পর্কে কোরআনে আরো শত শত বছর আগেই সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, "আকাশকে আমি ক্ষমতা দিয়ে বানিয়েছি এবং নিশ্চয়ই আমি এর সম্প্রসারণকারী।" (সুরা যারিয়াত-৪৭) "কাফেররা কি দেখেনা যে, "আকাশ মন্ডলী ও

পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল (সৃষ্টির একটা অংশ হিসেবে), অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম।" (সূরা আম্বিয়া-৩০)

চৌদ্দশত বছর পূর্বে বর্ণিত কোরআনের আয়াত ও বিশ শতকের বিগ ব্যাং থিওরির মধ্যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য কিছুতেই উপেক্ষণীয় নয়। যা প্রমান করে কোরআন বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও সর্বশ্রেষ্ঠ।

৩. শরীরের চামড়ায় ব্যথা উপলব্ধিকারী উপকরণ বিদ্যমান:

ত্বকে ব্যথা উপলব্ধিকারী উপকরণ বিদ্যমান থাকার তথ্যটি সাম্প্রতিককালে প্রমাণ করেন বিজ্ঞানী ড. তাগাতাত তেজাসেন। যে তথ্যটি কোরআনে ১৪ শত বছর পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, "যারা আমার আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে আগুনে দগ্ধ করব। যখন তাদের গায়ের চামড়া দগ্ধ হবে আমি সেই চামড়াকে নতুন চামড়া দ্বারা বদলে দেব। যেন তারা (শাস্তির পর) শাস্তি ভোগ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান।" (সূরা নিসা-৫৬)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আগুনে দগ্ধ হয়ে কষ্ট যন্ত্রনা ভোগ করার উপকরণ হিসেবে শরীরের চামড়াকে উল্লেখ করেছেন।

৪. মানব-ভ্রুণের বিকাশ:

মানব ভ্রুণের বিকাশ সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞান ভ্রুণ থেকে পূর্ণ মানুষে পরিণত হওয়ার একাধিক ধাপ বর্ণনা করেছে। যা বহু পূর্বে বর্ণিত কোরআনের আয়াতের সঙ্গে মিলে যায়। আল্লাহ বলেন, "আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি রক্তপি-, অতঃপর রক্তপি-কে পরিণত করি মাংসপি-, অতঃপর মাংসপি-কে পরিণত করি হাড্ডিতে, অতঃপর হাড্ডিকে গোস্ত দিয়ে আবৃত করি, অতঃপর তাকে অন্য এক সৃষ্টি রূপে গড়ে তুলি। অতএব নিপুনতম স্রষ্টা আল্লাহ কত কল্যাণময়।" (সূরা মুমিনুন-১৪)

৫. কোরআনের তাৎপর্যে বিজ্ঞানীদের ইসলাম গ্রহণ:

কোরআনের তাৎপর্য অনেক ব্যাপক। যার ফলে কোরআন নিয়ে গবেষণার একপর্যায়ে কোরআন দ্বারা অভিভূত হয়ে অনেক বিজ্ঞানী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এটি কোরআনের বিশেষ মুজিযা।

বিশেষ কিছু নমুনা পেশ করা হলো।

ক. চামড়ায় ব্যথা উপলব্ধিকারী উপকরণের উপস্থিতি নিয়ে গবেষণা করেছিলেন থাইল্যান্ডের চিয়াংমাই বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবদেহের গঠন সংক্রান্ত বিজ্ঞান (অহধঃড়সু)

বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তাগাতাত তেজাসেন। তিনি স্বীয় গবেষণার ফলাফল শত শত বছর পূর্বে বর্ণিত কোরআনের আয়াতের সাথে মিলে যাওয়ায় ও কোরআনের তাৎপর্য দেখে এতোটা মুগ্ধ হোন যে, তিনি ১৯৮১ সালের ১০ ডিসেম্বর সৌদি আরবের এক ইসলামিক কনফারেন্সে স্বেচ্ছায় কালিমা পাঠ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

যিনি চামড়ার গভীরে খুঁজছিলেন ব্যাথার রহস্য, সেই তিনিই চামড়ার আয়াতে খুঁজে পেলেন নিজ রবের মহত্ত্ব।

খ. কোরআনের সূরা হিজরের ২৬ নং আয়াত, "আর আমি মানুষকে শুকনো কাদা থেকে সৃষ্টি করেছি।"

আয়াতটি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে এর তাৎপর্য উপলব্ধি করে জাপানি বিজ্ঞানী ড. আতসুশি কামাল ওকুদা অভিভূত হোন ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

গ. কানাডিয়ান বিজ্ঞানী গ্যারি মিলার কোরআনে বৈজ্ঞানিক ভুল খুঁজতে গিয়ে জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করেন এবং কোরআনের বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব তথ্য দেখে এতোটা মুগ্ধ হোন যে, একপর্যায়ে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

ঘ. হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির বিখ্যাত বিজ্ঞানী ড. হেনরি লারসন কোরআনের বৈজ্ঞানিক নিদর্শন দেখে বিস্মিত হোন ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

এছাড়াও ইতিহাসে আরো অনেক ধর্মযাজক ও ধর্ম তাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ কোরআন নিয়ে গবেষণা করে কোরআনের সত্যতা উপলব্ধি করে ও প্রাপ্ত তথ্যে অভিভূত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। যা প্রমাণ করে, কোরআন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেও উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ একটি কিতাব। সেই উপলব্ধি থেকেই নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন বলেন, "ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান পঙ্গু, বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ।" কোরআন সরাসরি কোন বিজ্ঞান গ্রন্থ নয়; বরং বিজ্ঞান থেকেও শ্রেষ্ঠতর ও ইলাহি কিতাব। কোরআন সঠিক ও আলোর পথ প্রদর্শনকারী এবং মুক্তির দিশারী এক সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব। কোরআন সকলের জন্য হেদায়েতের বাণী।

আল-কুরআনে বিজ্ঞানের নিদর্শন

পৃথিবীতে তিন ধরনের জ্ঞানের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। যথা- (১) জন্মগত জ্ঞান, (২) অহীর জ্ঞান, (৩) দুনিয়াবী জ্ঞান।

(১) জন্মগত জ্ঞান : এই জ্ঞান আললাহ তা'আলা মানুষের জন্মের সাথে সাথে তার মধ্যে দিয়ে দেন। যেমন- একজন শিশু ব্যথা পেলে বা ক্ষুধা পেলে কান্না করা, মায়ের দুধ কিভাবে খেতে হবে তার জ্ঞান, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোন্টি দিয়ে কি কাজ করতে হবে তার জ্ঞান। এগুলো কোন শিশুকে শেখানো লাগে না। সে জন্ম থেকেই এই জ্ঞান রাখে।

(২) অহীর জ্ঞান : এই জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা তাঁর নির্বাচিত বান্দাদের দিয়ে থাকেন। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে এই জ্ঞানের আগমন সমাপ্ত হয়। অর্থাৎ এই জ্ঞান আর কারো নিকটে আসবে না। এই জ্ঞান নবী-রাসূল ছাড়া আর কেউ লাভ করার ক্ষমতা রাখে না। এই জ্ঞানের গভীরতা এত বেশী যে, এই জ্ঞানের মমার্থ মানুষের পক্ষে নির্ণয় সম্ভব নয়। যেমন- ছালাতের নিয়ম-কানূন, হজ্জের নিয়ম-পদ্ধতি এইগুলো এভাবে আমরা কেন করি তার প্রকৃত জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকটেই রয়েছে। তাই অহীর জ্ঞান হ'ল জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তর।

(৩) দুনিয়াবী জ্ঞান : পৃথিবীতে যে জ্ঞান ছড়িয়ে আছে বা মানুষের মধ্য হ'তে যে জ্ঞানের উদ্ভব হয় তা হচ্ছে দুনায়াবী জ্ঞান। এখানে কিছু প্রশ্ন তৈরী হয়। এই জ্ঞানের উৎস কি? মানুষের মধ্যে এই জ্ঞান কোত্থেকে আসল? এই বিষয়গুলো জানার জন্য আমাদের সূরা বাক্বারার ৩০-৩৩ নং আয়াতের প্রতি দৃকপাত করতে হবে। যেখানে আল্লাহ বলেছেন,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، قَالَ يَاآدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ-

‘আর (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব। তখন তারা বলল, আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যারা সেখানে কেবল অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরাই সর্বদা আপনার গুণগান করছি ও আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না। অনন্তর আল্লাহ আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন। অতঃপর সেগুলিকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন ও বললেন, তোমরা আমাকে এগুলির নাম বল, যদি তোমরা (তোমাদের কথায়) সত্যবাদী হও। তারা (বিস্মিত হয়ে) বলল, সকল পবিত্রতা আপনার জন্য। আমাদের কোন জ্ঞান নেই, যতটুকু আপনি আমাদের শিখিয়েছেন ততটুকু ব্যতীত। নিশ্চয়ই আপনি মহা বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ বললেন, হে আদম! তুমি এদেরকে এসবের নামগুলি বলে দাও। অতঃপর যখন আদম তাদেরকে ঐ সবের নাম বলে দিলেন, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আসমান ও যমীনের সকল গোপন বিষয়ে আমি সর্বাধিক অবগত এবং তোমরা যেসব বিষয় প্রকাশ কর ও যেসব বিষয় গোপন কর, সকল বিষয়ে আমি সম্যক অবহিত?’ (বাক্বারাহ ২/৩০-৩৩)।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা এবং ফেরেশতাদের কথোপকথনে এটা সুস্পষ্ট যে, দুনিয়ার সকল বস্তুর জ্ঞান আদম (আঃ)-কে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীর শুরু হ’তে শেষ পর্যন্ত যতগুলো বস্তুর উদ্ভব হবে এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে যত বস্তু রয়েছে তার সকল জ্ঞান আল্লাহ তা‘আলা আদম (আঃ)-কে দান করেছিলেন। যেহেতু ভবিষ্যতের খবর ফেরেশতারা জানে না। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞেস করা হ’লে তারা তা জানে না বলে। কারণ ঐ বস্তুগুলো ঐ মুহূর্তে পৃথিবীতে মওজূদ ছিল না। কিন্তু আদম (আঃ)-কে সবকিছুর জ্ঞান দান করার কারণে তিনি বস্তুগুলো সম্পর্কে বলে দিয়েছিলেন।

অর্থাৎ দুনিয়াবী জ্ঞানের মূল উৎস হ’ল আল্লাহ তা‘আলা আদম (আঃ)-কে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা। আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছা অনুযায়ী তা বিভিন্ন মানুষ হ’তে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হ’তে হ’তে আজ পৃথিবী এই অবস্থানে এসে পৌঁছেছে। এই জ্ঞানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সূক্ষ্ম জ্ঞান হ’ল বিজ্ঞান।

অক্সফোর্ড ডিকশনারী অনুসারে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা হ'ল : The intellectual and practical activity encompassing the systematic study of the structure and behaviour of the physical and natural world through observation and experiment. অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিক ও ব্যবহারিক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষার মাধ্যমে শারীরিক এবং প্রাকৃতিক বিশ্বের গঠন ও আচরণের পদ্ধতিগত অধ্যয়নকে বিজ্ঞান বলে। আর এই বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের সর্বাধিক অধিকারী হ'ল ইহুদী-নাছারারা, যা আমরা বর্তমানে পৃথিবীতে দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ বলেন,وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، 'স্মরণ কর আমাদের বান্দা ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের কথা। যারা ছিল শক্তিশালী ও চক্ষুষ্মান' (ছোয়াদ ৩৮/৪৫)।

ইব্রাহীম (আঃ)-এর পুত্র ইসহাক (আঃ) ও তাঁর পুত্র ইয়াকূব (আঃ)। আর ইয়াকূব (আঃ)-এর বংশধর হ'ল এই ইহুদী-নাছারারা। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সূক্ষ্ম জ্ঞান দান করেছেন। আর সূক্ষ্ম জ্ঞান বলতে বিজ্ঞানের জ্ঞানকেই বুঝায়।

বিজ্ঞানের কাজ হ'ল আল্লাহ তা'আলা মানুষ, মহাবিশ্ব, পৃথিবী ও পৃথিবীর অভ্যন্তরের বস্তুসমূহ যে নীতিমালায় পরিচালনা করেন তা গবেষণার মাধ্যমে মানুষের নিকট প্রকাশ করা। এটা হ'ল মুসলিমের বিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা।

আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান

আল কুরআন বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কালাম বা বাণী। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে। সে দায়িত্ব যেন মানুষ সঠিকভাবে প্রতিপালে সক্ষম হয় সে জন্য পাঠিয়েছেন নবী ও রাসূল, নাজিল করেছেন কিতাব।

প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী আদি পিতা আদম (আ.) থেকে নূহ (আ.)-এর পূর্ব পর্যন্ত নবীগণ (তাকভিনিয়াত) সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রকৃতিবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান চর্চা করেছেন অধিক

হারে। হজরত নূহ (আ.) থেকে শুরু করে (তাশরিইয়াত) বিধিবিধান ব্যাপকতা লাভ করে।

আল কুরআন কোনো ইতিহাস গ্রন্থ নয়; কিন্তু এতে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের তথ্য ও তত্ত্ব। আল কুরআন কোনো সাহিত্যকর্ম নয়; কিন্তু এতে রয়েছে সাহিত্যের সব রসদ। আল কুরআন কোনো গল্প-উপন্যাস নয়; কিন্তু এতে রয়েছে জগতের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক কাহিনি।

আল কুরআন কোনো কাব্যগ্রন্থ নয়; কিন্তু এতে রয়েছে কালোত্তীর্ণ অমর মহাকাব্যের সব ধরনের উপাদান। আল কুরআন জীবন্ত মুজিজা।

মানুষের জীবন চলার পথে পরিবেশ ও প্রতিবেশকে ইতিবাচক ও কল্যাণকর রূপে ব্যবহারের পরিশীলিত সুবিন্যস্ত জ্ঞানই হলো বিজ্ঞান। আল কুরআন শ্রেষ্ঠতম মহাবিজ্ঞান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা কুরআনে কারিমে বলেন-'শপথ বিজ্ঞানময় কুরআনের।' (৩৬:২)।

কুরআনে হাকিমের প্রথম অবতীর্ণ পঞ্চ আয়াতেও তার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে : 'পড় তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন; যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্তপিণ্ড থেকে। পড়; আর তোমার রব মহীয়ান; তিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষাদান করেছেন, মানুষকে তা শিখিয়েছেন, যা সে জানত না।' (৯৬:১-৫)।

বিজ্ঞানীরা তাদের নানা আবিষ্কারে কুরআন থেকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন; তাদের তথ্য ও তত্ত্বগুলো কুরআনিক সূত্রের অনুকূলে এসেছে। বিশ্বের বহু সেরা সেরা বিজ্ঞানী কুরআন পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

যেমন বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী ড. মরিস বুকাইলী, যিনি 'বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান' নামক একটি বই লিখেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলো ও কুরআন পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ। এতকাল যেসব আয়াতের ব্যাখ্যা করা কঠিন ছিল, আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান

আমাদের সেসবের অর্থ বোঝার ব্যাপারে সাহায্য করেছে। আল কুরআনের বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলো প্রমাণ করে এটি আসমানি কিতাব।

আল কুরআনে রয়েছে জ্ঞানবিজ্ঞান সব মৌলিক বিষয়। যেমন- জ্যোতিষ শাস্ত্র, বিশ্ব সৃষ্টি ও মহাবিস্ফোরণ (বিগ ব্যাংগ) প্রসঙ্গ, ছায়াপথ সৃষ্টির আগে প্রাথমিক গ্যাস পিণ্ড, পৃথিবীর আকার গোল। আছে পদার্থবিজ্ঞান, পানিবিজ্ঞান, পানিচক্র, বাষ্পে পরিণত হওয়া। আছে ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞান, পাহাড় পর্বতের রহস্য, মহাসাগর, মিষ্টি ও লবণাক্ত পানির বিবরণ এবং রয়েছে উদ্ভিদ বিজ্ঞান। রয়েছে প্রাণিবিজ্ঞান, পাখির উড্ডয়ন, মৌমাছির দক্ষতা, মাকড়সার জাল, পিপিলিকার জীবনধারা ও যোগাযোগ। আছে চিকিৎসাবিজ্ঞান, ওষুধ ও পথ্য। রয়েছে শরীরতত্ত্ব, রক্ত চলাচল, দুগ্ধ ও ভ্রূণতত্ত্ব এবং সাধারণ বিজ্ঞান ও আঙুলের ছাপ ইত্যাদি।

ভ্রূণতত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞানের জটিলতম একটি বিষয়। আল কুরআনে ভ্রূণ সৃষ্টি ও এর বিকাশ সম্পর্কিত যথাযথ বর্ণনা রয়েছে। 'আমি তো মানুষকে মাটির উপাদান থেকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে এক নিরাপদ আধারে স্থাপন করি, পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে, অতঃপর জমাট রক্তকে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপিঞ্জরে, অতঃপর অস্থিপিঞ্জরকে মাংস দ্বারা ঢেকে দিই, অবশেষে তাকে রূপ দান করি। সুনিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান! এরপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর কেয়ামতের দিন তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে। আমি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সাজিয়েছি, অমি সৃষ্টির বিষয়ে বেখবর নই।' (২৩:১২-১৭)।

কানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের এনাটমি বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, শীর্ষস্থানীয় ভ্রূণতত্ত্ববিদদের অন্যতম কিথ মুর, কুরআনের এসব বক্তব্য ও সহিহ হাদিসের বিবরণ সম্পর্কে বলেন, 'উনিশ শতক পর্যন্ত, মানবীয় বিকাশের ধাপগুলো সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না। উনিশ শতকের শেষ দিকে বর্ণমালার প্রতীকের ওপর ভিত্তি করে মানব ভ্রূণের বিকাশের বিভিন্ন ধাপ চিহ্নিত করা হয়।

ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এনাটমি বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান এবং ফিলাডেলফিয়ারটমাস জেফারসন বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্যানিয়েল বাও ইনস্টিটিউটের পরিচালক মার্শাল জনসন বলেন, 'বিজ্ঞানী হিসাবে আমি ভ্রূণতত্ত্ব এবং ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি বুঝতে পারি। আমাকে যদি আমার আজকের জ্ঞান ও বর্ণনার যোগ্যতাসহকারে সেই যুগে স্থানান্তর করা হয়, কুরআনে যে বর্ণনা রয়েছে সেভাবে বর্ণনা করতে পারব না।'

আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম সাফল্য মহাকাশবিজ্ঞান। এ বিষয়ে আল কুরআনে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। 'অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং জীবন্ত সবকিছু পানি থেকে সৃষ্টি করলাম; তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না?' (২১:৩০)। এটি আধুনিক বিজ্ঞানের 'বিগ-ব্যাং' তত্ত্বের অনুরূপ। পানি থেকে জীবন সৃষ্টির উল্লেখ হয়েছে এটিও সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। সব জীবিত প্রাণী প্রটোপ্লাজম দিয়ে তৈরি, যার ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশই পানি।

অধুনা বিজ্ঞানীরা বলছেন, মহাজগৎ সদা সম্প্রসারণশীল। এ প্রসঙ্গটিও আল কুরআনে রয়েছে- 'আমি আমার ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমিই একে সম্প্রসারিত করছি।' (৫১:৪৭)।

মহাবিশ্বে সবকিছুই ঘূর্ণায়মান বা চলমান। এ বিষয় সম্পর্কে আল কুরআনের বর্ণনা : 'আল্লাহই দিন ও রাত করছেন, সৃষ্টি করেছেন চন্দ্র ও সূর্য। প্রত্যেকেই নিজ নিজ গতিতে কক্ষপথে সন্তরণ করছে।' (৩৬:৩৮-৪০)। 'তিনিই সূর্যকে তেজষ্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং তার তিথি নির্দিষ্ট করেছেন।' (১০:৫)। কুরআনে সূর্যকে 'সিরাজ' বলা হয়েছে যা স্বীয় আলো, আর চন্দ্রকে 'নূর' বলা হয়েছে যা অন্য উৎস থেকে ধার করা। ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞান প্রসঙ্গে আল কুরআনে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে- 'আমি কি ভূমিকে বিছানা ও পর্বতকে কীলক সদৃশ করিনি?' (৭৮:৬-৭)।

কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান: সামঞ্জস্যপূর্ণ না অসামঞ্জস্যপূর্ণ?

‘কোরআন ও আধুনকি বিজ্ঞান-এবিষয়ের উপর বহু বই পুস্তক তৈরি হয়েছে এবং আরো অনেক গবেষণা চলছে।ইনশাআল্লাহ,এই গবেষণা মানব জাতিকে আল্লাহর বাণীর নিকটবর্তী করবে।এ পুস্তিকায় কোরআনের অল্প কয়েকটি বৈজ্ঞানিক সত্যই তুলে ধরা হয়েছে।আমি বিষয়টির উপর পূর্ণ ইনসাফ করতে পেরেছি বলে দাবী করিনা।

অধ্যাপক তেজাসেন কোরআনের একটি মাত্র আয়াতের শক্তির কারনে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।কোরআন ঐশী গ্রন্থ কিনা এবিষয়ে কেউ হয় তো ১০টি নিদর্শন আবার কেউ হয়তো ১০০টি নিদর্শনের প্রয়োজন অনুভব করতে পারে।আবার কেউ ১ হাজার নিদর্শন দেখেও ইসলাম গ্রহন করবেনা।কোরআন এ জাতীয় বদ্ধ অন্তরের নিন্দা করে বলেছেঃ

‘তারা বধির,বোবা ও অন্ধ,তারা কখনও ফিরে আসবেনা।সূরা আলবাকারা-১৮

পবিত্র কোরআন ব্যক্তি ও সমাজের জন্য পরিপূণ জীবন ব্যবস্থা।কোরআনী জীবন ব্যবস্থা মানুষের অজ্ঞতার ভিত্তিতে তৈরি বিভিন্ন মতবাদ থেকে অনেক উন্নত।স্রষ্টার চাইতে অপেক্ষাকৃত ভাল হেদায়েত কে দিতে পারে?

আমি দোআ করি,আল্লাহ যেন এই সামান্য প্রচেষ্টাটুকু কবুল করেন।আমি তাঁর ক্ষমা ও হেদায়াত প্রার্থী।

কোরআনে কোন কোন বৈজ্ঞানিক ভুল রয়েছে?

কুরআন সরাসরি কোনো বিজ্ঞানগ্রন্থ বা বিজ্ঞানের পাঠ্যবই নয়; এটি মূলত একটি ধর্মীয় ও নৈতিক দিকনির্দেশনা গ্রন্থ। তবে এতে মহাবিশ্ব, পৃথিবী এবং মানবদেহ সৃষ্টির নানা বর্ণনা রয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে কিছু আয়াতের আক্ষরিক অর্থের অমিল বা বিতর্ক তুলে ধরে অনেকে এগুলোকে বৈজ্ঞানিক ত্রুটি হিসেবে দাবি করেন।

কুরআনের কথিত বা সমালোচিত এমন কয়েকটি প্রধান বিষয় নিচে তুলে ধরা হলো:

১. মহাবিশ্ব সৃষ্টির ক্রম এবং সময়কাল

কুরআনের সূরা ফুসসিলাতের (৪১:৯-১২) আয়াতগুলোতে পৃথিবী ও মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময়কাল মোট ৬ দিন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ পৃথিবী তৈরি করেছেন ২ দিনে, এরপর আরও ২ দিনে পাহাড় ও বরকত স্থাপন করেছেন (মোট ৪ দিন) এবং সবশেষে আকাশ বা মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং বিগ ব্যাং (Big Bang) তত্ত্ব অনুযায়ী, মহাবিশ্ব সৃষ্টির কোটি কোটি বছর পর পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। একই সাথে আকাশ ও পৃথিবী সমান্তরালভাবে বা পর্যায়ক্রমে তৈরি হওয়ার এই বর্ণনার সাথে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্রমানুসারী ধারার পার্থক্য দেখা যায়।

২. ভ্রূণ সৃষ্টির পর্যায়ক্রম

সূরা আল-মুমিনুনের (২৩:১৪) আয়াতে মানব ভ্রূণ সৃষ্টির ধাপগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, প্রথমে শুক্রবিন্দু (নুতফা), এরপর রক্তপিণ্ড (আলাকাহ), তারপর মাংসপিণ্ড (মুদগাহ) থেকে হাড় তৈরি হয় এবং সবশেষে মাংসে আবৃত করা হয়। ভ্রূণবিদ্যার (Embryology) আধুনিক আবিষ্কার অনুযায়ী, মানুষের হাড় এবং মাংসপেশি মূলত একই সাথে বা সমান্তরালে গঠিত হতে শুরু করে, কোনোটি অন্যটির জন্য অপেক্ষা করে না।

৩. সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষপথ

সূরা আল-আম্বিয়ার (২১:৩৩) এবং সূরা ইয়াসিনের (৩৬:৪০) আয়াতে বলা হয়েছে, সূর্য ও চন্দ্র প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটে বা ঘোরে। আধুনিক বিজ্ঞান অনুযায়ী, চন্দ্র পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে। কিন্তু সূর্য কোনো নির্দিষ্ট গ্রহ বা উপগ্রহের চারপাশে ঘোরে না, বরং তা গ্যালাক্সি বা ছায়াপথের কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে আবর্তন করে।

৪. পৃথিবীর আকৃতি ও স্থিরতা

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে (যেমন- সূরা আল-হিজর ১৫:১৯, সূরা আত-তারেক ৮৬:৫-৭) পৃথিবীকে বিছানো, চ্যাপ্টা বা কার্পেটের মতো বিস্তৃত করা হয়েছে বলে উল্লেখ আছে। এছাড়া সূরা আন-নাহলের (১৬:১৫) আয়াতে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে পাহাড় সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে এটি কেঁপে না যায় বা স্থির থাকে। আধুনিক ভূতত্ত্ব অনুসারে পৃথিবী গোলকাকার বা উপবৃত্তাকার এবং এটি মহাশূন্যে অনবরত গতিশীল (ঘূর্ণনশীল ও পরিক্রমণশীল), স্থির নয়।

৫. নক্ষত্র বা তারকার অবস্থান

সূরা আল-মুলকের (৬:৫) আয়াতে বলা হয়েছে, নিকটতম আকাশকে প্রদীপমালা (নক্ষত্র) দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে এবং এগুলোকে শয়তান তাড়ানোর মাধ্যম বা উল্কাপাত হিসেবে ব্যবহার করা হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী, তারকারাজির অবস্থান পৃথিবী থেকে আলোকবর্ষ দূরে এবং সেগুলো মূলত জ্বলন্ত গ্যাসীয় গোলক, যা শয়তান তাড়ানোর কোনো কাজে ব্যবহার হওয়ার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ:

সমালোচকদের মতে: আক্ষরিক অর্থ বিচার করলে এই বর্ণনাগুলো প্রাচীনকালের মানুষের পর্যবেক্ষণ এবং তৎকালীন প্রচলিত ধারণার (যেমন- টলেমির মডেল বা ব্যাবিলনীয় ধারণা) সাথে মিলে যায়।

ধার্মিক ও ব্যাখ্যাকারীদের মতে: কুরআনের ভাষা রূপক বা আলঙ্কারিক। এসব আয়াতকে বিজ্ঞানের আধুনিক সূত্রের সাথে আক্ষরিক অর্থে মিলিয়ে না দেখে, মানুষের সহজবোধ্য ভাষায় আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক সত্য হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

মহান করুণাময় আল্লাহ তায়ালা হযরত মহাম্মাদ (সা) এর প্রতি পবিত্র কোরাণ নাযিল করেন। অতএব এই

কোরাণই হল বর্তমান এবং অতিতের সব উন্নতির উৎস। অতএব যে, কোরান হল একটি সমুদ্রের মত যার

কোন তীরে নেই এবং যে “সমুদ্র যদি আমার প্রভুর বাণীর জন্য কালি হয়ে যায়, তবে আমার প্রভুর কথার

আগে অবশ্যই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে। শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে." ঈশ্বরের কাজের মধ্যে—তিনি উন্নীত

হতে পারেন—যাকে [তাদের বিশালতার জন্য বলা যেতে পারে] তাঁর কাজের সাগর, উদাহরণস্বরূপ, পুনরুদ্ধার
এবং রোগ, যেমন তিনি-উন্নত হতে পারেন—আব্রাহিমের বাণী বর্ণনা করে বলেছেন, "যখন আমি অসুস্থ
হই, তিনিই আমাকে সুস্থ করে তোলে।

এবং সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, যে সমস্ত কাজ এবং উন্নতি সেই মহান আল্লাহ এবং তার গুণাবলীর
অন্তর্ভুক্ত এবং পবিত্র কোরানই হল সারমর্ম অথবা সমস্ত উন্নতির ব্যাখা। যেমন এই বিজ্ঞানের
কোন সিমার ছেদ নেয়, সেইভাবেই বিজ্ঞানের প্রতি এই পবিত্র কোরাণের প্রতিদানও কোন কম নয়।

বর্ণনাঃ

কুরআনকে সমস্ত জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিবেচনা করার দৃষ্টিভঙ্গি নতুন নয়, এবং আমরা অতীতের
অনেক মহান মুসলিম পণ্ডিতকে দেখতে পাই যারা এই মতের প্রবক্তা। একজন পন্ডিত ইমাম আল-
গাজ্জালী রহ. তাঁর ইহিয়া 'উলুম আল-দীন (ধর্ম বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন) গ্রন্থে তিনি ইবনে মাসউদকে
উদ্ধৃত করেছেন যে: “যদি কেউ প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞান পেতে চায় তবে তার উচিত কুরআন
নিয়ে চিন্তা করা।

এবং দৈনদীন জিবনের প্রত্যেকটি বিজ্ঞান এবং এর উন্নতি আমরা স্বচক্ষে পরিভাব করিতে থাকি।
অর্থাৎ বর্তমান এবং অতিত আমরা অনেক লোককে দেখি বা দেখে এসেছি যে , যারা আমাদের বর্তমান

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রতি মূল্য বা গুরুত্ব দেয় সাধারণত তারা কোরাআন আয়াত দ্বারা ব্যাখা করার
চেষ্টা করে।
শুধু এই নয় বরং ইমাম আল গাজ্জালি রহ ইহিয়া 'উলুম আল-দীন এর পরে লিখা হয়েছিল জাওয়াহির আল-
কুরআন (কুরআনের রত্ন), তিনি এই বিষয়ে আরও কিছু বলেছেন। "কুরআন থেকে প্রাচীন ও আধুনিকদের
বিজ্ঞানের কান্ড"।

এই সমস্ত বিজ্ঞানের নীতি,উন্নতি যা আমরা দিন বা দিন গণনা করেছি এবং যেগুলিকে আমরা নির্দিষ্ট
করিনি, সেগুলি কোরানের বাইরে নয়, কারণ এই সমস্ত বিজ্ঞানগুলি ঈশ্বরের জ্ঞানের একটি সমুদ্র থেকে
নেওয়া হয়েছে - তিনি যেন মহিমান্বিত হন - অর্থাৎ , তাঁর কাজের সমুদ্র। অতএব এই সমস্ত জ্ঞান ও
বিজ্ঞান এই পবিত্র কোরান এর দ্বারা মহিত।
যেমন বিজ্ঞান পৃথিবীর সৃষ্টির এই বিষয় নিয়ে নানারকম ধারণা প রি চালনা করেন বা দৈনদীন ভাবে করে
আসছে।

কুরআনের কি কি বিষয় আছে যেগুলো ভবিষ্যতে আবিষ্কার হতে পারে অথবা সত্যি হতে পারে?

কুরআনে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী এবং বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিত রয়েছে, যেগুলোর কিছু ইতোমধ্যে সত্য প্রমাণিত হয়েছে, আর কিছু ভবিষ্যতে প্রমাণিত হতে পারে। এখানে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হলো:

১. মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ ও সংকোচন

কুরআনে বলা হয়েছে:
"আমি তো আকাশমণ্ডলীকে আমার ক্ষমতা বলে সৃষ্টি করেছি এবং অবশ্যই আমি এটিকে সম্প্রসারিত করছি।" (সূরা আয-যারিয়াত ৫১:৪৭)

নাসার গবেষণা অনুযায়ী, মহাবিশ্ব ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে, যা বিগ ব্যাং তত্ত্বের সঙ্গে মিলে যায়। ভবিষ্যতে মহাবিশ্ব সংকুচিত হবে কিনা, তা নিয়ে গবেষণা চলছে, যা কুরআনের আরেকটি সম্ভাব্য ইঙ্গিত হতে পারে।

২. গভীর সমুদ্রে অন্ধকার ও অভ্যন্তরীণ তরঙ্গ

কুরআনে বলা হয়েছে:
"বা সাগরের নিকষ অন্ধকারের ন্যায়, যা ঢেউয়ের ওপরে ঢেউ দ্বারা আচ্ছাদিত, তার ওপরে মেঘ; অন্ধকারের ওপর অন্ধকার..." (সূরা আন-নূর ২৪:৪০)

বিজ্ঞানীরা আধুনিক গবেষণায় প্রমাণ করেছেন যে সমুদ্রের গভীরে সূর্যের আলো পৌঁছে না, ফলে সেখানে ঘন অন্ধকার থাকে। এছাড়া, সমুদ্রের অভ্যন্তরে একাধিক স্তরের ঢেউ রয়েছে, যা আধুনিক সমুদ্রবিদ্যা দ্বারা প্রমাণিত।

৩. জীবনের উৎস পানিতে

"আমি প্রত্যেক জীবিত বস্তুকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না?" (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৩০)

বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে পৃথিবীর সব জীবের কোষীয় গঠনের প্রধান উপাদান পানি। ভবিষ্যতে, যদি অন্য গ্রহেও প্রাণের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, তাহলে সম্ভবত সেটিও পানির ভিত্তিতে গঠিত হবে।

৪. ভবিষ্যতের পরিবেশগত সংকট

"মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও জলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে..." (সূরা আর-রূম ৩০:৪১)

বর্তমানে, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশদূষণ, এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার বৈশ্বিক সংকট সৃষ্টি করছে। ভবিষ্যতে এটি আরও মারাত্মক হতে পারে।

৫. নতুন গ্রহে বসবাসের সম্ভাবনা

কুরআনে বলা হয়েছে:
"আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চাইলে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে এক নতুন সৃষ্টি নিয়ে আসতে পারেন।" (সূরা ইবরাহীম ১৪:১৯)

এ থেকে বোঝা যায়, ভবিষ্যতে মানুষ হয়তো নতুন কোনো গ্রহে বসবাস করতে পারবে বা আল্লাহ নতুন কোনো বসবাসযোগ্য স্থান তৈরি করতে পারেন।

৬. মানব মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালী ও চিন্তাশক্তি

কুরআনে বলা হয়েছে:
"না! যদি সে বিরত না হয়, আমি অবশ্যই তার কপালের সামনের অংশ (নাসিয়াহ) ধরে টেনে আনবো, যা এক মিথ্যাবাদী, পাপাচারী কপাল।" (সূরা আল-আলাক ৯৬:১৫-১৬)

আধুনিক নিউরোসায়েন্স প্রমাণ করেছে যে, মানুষের সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং নৈতিকতা নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র হলো "prefrontal cortex" যা ঠিক কপালের সামনের দিকে অবস্থিত। ভবিষ্যতে এর কার্যকারিতা নিয়ে আরও গবেষণা হতে পারে।

৭. ভিনগ্রহের প্রাণী (Extraterrestrial Life)

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যেসব প্রাণী রয়েছে, এবং ফেরেশতারা—তারা সবাই আল্লাহরই ইবাদত করে..." (সূরা আশ-শূরা ৪২:২৯)

এ থেকে ধারণা করা যায়, পৃথিবীর বাইরেও প্রাণের অস্তিত্ব থাকতে পারে। ভবিষ্যতে, যদি বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বাইরের প্রাণ খুঁজে পান, তাহলে এটি কুরআনের এই আয়াতের সঙ্গে মিলতে পারে।

৮. মানবদেহের অঙ্গ প্রতিস্থাপন ও পুনর্জন্ম

কুরআনে আল্লাহ বলেছেন:
"তারা বলে, যখন আমরা হাড়ে পরিণত হবো এবং (মাটিতে) গলে যাবো, তখনও কি নতুনভাবে সৃষ্টি হবো?" (সূরা আস-সাজদাহ ৩২:১০)

আজকের জিন প্রযুক্তি ও অঙ্গ প্রতিস্থাপন প্রযুক্তি উন্নতির পথে, যা ভবিষ্যতে মানুষের দেহ পুনরায় গঠনের সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে।

৯. পরকালের দৃশ্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

"যেদিন সূর্যকে একত্র করা হবে চন্দ্রের সাথে।" (সূরা আল-কিয়ামাহ ৭৫:৯)

বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, একদিন সূর্য এমনভাবে বিস্ফোরিত হবে বা প্রসারিত হবে যে তা চাঁদকে গ্রাস করতে পারে।

১০. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মানুষের সীমাবদ্ধতা

কুরআনে বলা হয়েছে:
"তোমাদের জ্ঞান অতি সামান্য।" (সূরা আল-ইসরা ১৭:৮৫)

মানুষের জ্ঞান সীমিত, কিন্তু প্রযুক্তি ক্রমাগত উন্নত হচ্ছে। ভবিষ্যতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হয়তো মানুষের চেয়ে বেশি তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারবে, কিন্তু মানবিকতা ও আত্মা সংক্রান্ত বিষয়গুলো কৃত্রিমভাবে তৈরি করা সম্ভব হবে না।

কুরআনের অনেক বক্তব্য ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের আরও অগ্রগতির মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত হতে পারে। এটি আল্লাহর একটি অপার রহস্য, যা ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হচ্ছে।

সর্বপ্রথম কুরআনে হরকত যুক্ত করেন কে?
কীভাবে একজন ব্যক্তি দুর্বলতা প্রকাশ না করে বিনয়ী হতে পারে?
মানুষ যখন কোরআন, হাদিস পড়া ভুলে যাবে; তখন তারা মানুষের মতবাদ গ্রহণ করতে শুরু করে। সেটা কি আপনার বিশ্বাস হয়?
আল-কোরান যে সত্য এটার প্রমান কী?
পবিত্র কোরআন সর্বপ্রথম কত সালে, কোন স্থানে, কার উপর কোন আয়াত নাজিল হয়?
কুরআনে এমন কিছু বিষয় উল্লেখ আছে, যা বিজ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে ধাপে ধাপে প্রমাণিত হচ্ছে, আবার কিছু বিষয় হয়তো ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হতে পারে। কিছু সম্ভাব্য বিষয় হলো—

১. মহাবিশ্বের বিস্তৃতি

কুরআনে বলা হয়েছে:
"আর আমি আকাশকে সৃষ্টি করেছি মহাশক্তি দ্বারা, এবং আমি অবশ্যই এটিকে সম্প্রসারিত করছি।" (সূরা আয-যারিয়াত: ৪৭)

আধুনিক বিজ্ঞান, বিশেষত বিগ ব্যাং থিওরি অনুযায়ী, মহাবিশ্ব ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে মহাবিশ্বের শেষ পরিণতি কী হবে (যেমন Big Crunch বা Big Rip) – তা কুরআনের এই আয়াতের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।

২. বহু-বিশ্ব (Multiverse) তত্ত্ব

কুরআনে বলা হয়েছে:
"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলো সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আল-আন'আম: ১)

কিছু ব্যাখ্যাকারীর মতে, এখানে "আকাশমণ্ডলী" বলতে একাধিক মহাবিশ্বের ইঙ্গিত থাকতে পারে, যা আজকের মাল্টিভার্স তত্ত্বের সঙ্গে মিলে যায়।

৩. মানব ভ্রূণ বিকাশ ও ক্লোনিং

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি নির্যাস থেকে, অতঃপর তাকে এক স্থানে শক্তভাবে স্থাপন করেছি। অতঃপর আমি শুক্রকে জমাট রক্তে রূপান্তর করেছি, অতঃপর সেই রক্তপিণ্ডকে মাংসপিণ্ড করেছি..." (সূরা আল-মুমিনুন: ১২-১৪)

উপসংহারে এটাই বলা যায়,
আধুনিক বিশ্বের নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সামাজিক পরিবর্তন ও মানবজীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধানে কুরআনের নির্দেশনা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ও সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। কুরআন শুধু একটি ধর্মীয় গ্রন্থ নয়; এটি মানবজাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ও হিদায়াতের উৎস। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষ যত নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছে, ততই কুরআনের সত্যতা ও বাস্তব নিদর্শন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাই আমাদের উচিত কুরআনকে শুধু তিলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এর শিক্ষা ব্যক্তিজীবন, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা। তবেই মানবজাতি শান্তি, সফলতা ও কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ।